নতুন যুগের নতুন 'হালখাতা': কৃষক কার্ড

পরীক্ষিৎ চৌধূরী

পহেলা বৈশাখে মিষ্টির প্যাকেট হাতে দোকানে যাওয়া, পুরনো বাকি মেটানো আর নতুন খাতায় নাম তোলা- হালখাতার এই ঐতিহ্য বাংলার মাটিতে শুধু একটি আচার নয়, একটি প্রতিশ্রুতির উৎসবও। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষকের জন্য এই হালখাতার উৎসবের রং বরাবর ফিকেই থেকে গিয়েছে। কারণ তার প্রতি দেওয়া ওয়াদা কেউই কখনো পূরণ করেনি। ফলে কৃষক খুব কমই ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়, এবং প্রায় সময় সার-বীজে ভর্তুকি পেতে তাকে দালালের দ্বারস্থ হতে হয়। হিসেবের খাতার ব্যালেন্সের ঘরে তার জমে ওঠে ঋণের বোঝায় নুয়ে পড়া মেরুদন্ড।

এবারের বৈশাখে সরকার সেই পুরনো খাতা পাল্টানোর সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিল 'কৃষক কার্ড' কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৪৩৩ সালের প্রথম দিনে টাঙ্গাইলের মাটিতে দাঁড়িয়ে যখন এই কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন, তখন সেটি শুধু একটি প্রতিশ্রুতি ছিল না; বরং ছিল অবহেলার ইতিহাসের বৃত্ত ভেঙে বহুদিনের স্বপ্ন আর সম্ভাবনার ভবিষ্যতের এক মিলিত প্রতিধ্বনি। লক্ষণীয়, এই সরকার প্রান্তিক মানুষের প্রশ্নে কেবল বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। ক্ষমতায় আসার পরপরই ফেব্রুয়ারিতেই ১২ লাখ কৃষকের ঋণ সুদসহ মওকুফের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মাত্র ২১ দিনের মাথায় চালু করেছে দরিদ্র ও দুস্থ প্রান্তিক নারীর হাতে তুলে দিয়েছে ফ্যামিলি কার্ড।

বাংলাদেশে কৃষিঋণ মওকুফের এই রাজনৈতিক ঐতিহ্য নতুন নয়। নব্বইয়ের দশকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারও ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করেছিল, যা সে সময় কৃষি উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। কৃষক কার্ড সেই ধারাবাহিকতারই পরবর্তী ধাপ। তবে এবার পরিসর এবং উচ্চাভিলাষ দুটোই অনেক বড়ো । এই কার্ড প্রতিটি কৃষকের একটি ডিজিটাল পরিচয়, যার মাধ্যমে ভূমিহীন থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা পাবেন ন্যায্যমূল্যে সার-বীজ, সহজ শর্তে কৃষিঋণ, কৃষিবিমা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস। সরাসরি নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে সরকারি প্রণোদনা। ভূমিকেন্দ্রিক কৃষকরাই কেবল নয়, মৎস্যচাষি ও প্রাণিসম্পদ খামারিরাও এই কর্মসূচির আওতায় আসছেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে আটটি বিভাগের দশটি জেলার এগারোটি উপজেলায় ২২ হাজার ৬৫ জন কৃষককে এই কার্ড দেওয়া হচ্ছে, যাদের মধ্যে বিশ হাজারেরও বেশি সম্পূর্ণ ভূমিহীন। জাতীয় পরিচয়পত্র ও স্থানীয় সরকারের প্রত্যয়নপত্র দিয়ে 'মাই জিওভি' ওয়েবসাইটে আবেদনের সুযোগ রেখে নিবন্ধন প্রক্রিয়াটিকেও সহজ রাখা হয়েছে। আসল কথা হলো, মধ্যস্বত্বভোগীকে পাশ কাটিয়ে রাষ্ট্রের সুবিধা এবার সরাসরি কৃষকের হাতে পৌঁছানোর একটি কাঠামো তৈরি হচ্ছে, এটিই এই উদ্যোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এই দেশে উন্নয়নের হিসাব হয় জিডিপিতে, অবকাঠামোতে, শহরের দিগন্তজোড়া আলোয়। কিন্তু সেই হিসেবের খাতায় যার নাম প্রায় অনুপস্থিত, তিনিই এই অর্থনীতির আসল স্তম্ভ- কৃষক। খাদ্য নিরাপত্তা থেকে গ্রামীণ জীবিকা, সবকিছুর ভার বহন করেও তিনি রয়ে গেছেন রাষ্ট্রের দৃষ্টির বাইরে- প্রান্তিকতার এক নীরব বৃত্তে। এই পটভূমিতেই কৃষক কার্ডের ঘোষণাটি আলাদা মনোযোগ দাবি করে। আগামী পাঁচ বছরে ২ কোটি ২৭ লাখ কৃষকের হাতে পৌঁছাবে এই পরিচয়পত্র। সংখ্যার বিচারে এটি বড়ো, কিন্তু এর আসল গুরুত্ব সংখ্যায় নয়। গুরুত্ব হলো এই স্বীকৃতিতে যে রাষ্ট্র এবার সত্যিকার অর্থেই কৃষকের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। তাই এটি নিছক একটি সরকারি প্রকল্প নয়। সফল হলে এটি হবে রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে দীর্ঘ অবহেলার সম্পর্ক পুনর্গঠনের একটি ঐতিহাসিক সূচনা।

প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তায় কৃষকের জীবন বদলানো সম্ভব। এই সত্য কেবল তত্ত্বে নয়, বিশ্বের একাধিক দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত। প্রতিবেশী ভারতে ১৯৯৮ সালে চালু হওয়া কিষান ক্রেডিট কার্ড আজ সাত কোটিরও বেশি কৃষকের হাতে পৌঁছেছে, যার মধ্যে স্বল্পসুদে ঋণ, বীমা সুবিধা আর ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা অন্যতম। ব্রাজিলের PRONAF কার্যক্রম ক্ষুদ্র কৃষককে ভর্তুকিযুক্ত ঋণ ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে দেশটির কৃষি রপ্তানিকে বৈশ্বিক মঞ্চে নিয়ে গেছে। কেনিয়া আজ বিশ্বজুড়ে এক অনন্য মডেল হিসেবে আলোচিত, যেখানে অবকাঠামোর দুর্বলতাকে পাশ কাটিয়ে মোবাইল প্রযুক্তির মাধ্যমে আর্থিক সেবা পৌঁছে গেছে প্রত্যন্ত কৃষকের দোরগোড়ায়। M-Pesa-র হাত ধরে শুরু হওয়া এই যাত্রায় কৃষক এখন মোবাইলেই জানতে পারেন বাজারমূল্য, মধ্যস্বত্বভোগীর খপ্পর এড়িয়ে সরাসরি ক্রেতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন এবং বিক্রি করতে পারেন ফসল।

তবে এই সাফল্যগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসেনি। সেখানে কার্ডের পাশাপাশি ছিল কৃষকের ডিজিটাল সাক্ষরতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ, স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহির কাঠামো এবং বাস্তবায়নে ধারাবাহিকতা। দক্ষিণ কোরিয়া ষাট ও সত্তরের দশকে 'সেমাউল উন্দং' আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষককে শুধু সুবিধাভোগী নয়, উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে গড়ে তুলেছিল। সেটিই পরে দেশটির শিল্পায়নের ভিত্তি হয়েছিল। নতুন কৃষক কার্ডের ঘোষণাকে সাধারণ কৃষকেরা ইতিবাচকভাবেই দেখছেন। গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তাঁরা জানান, এই উদ্যোগ যদি সত্যিকার অর্থে কাজ করে, তাহলে দীর্ঘদিনের কিছু ভোগান্তি থেকে মুক্তি মিলতে পারে। কারো কারো মতে, কার্ডের মাধ্যমে সময়মতো ন্যায্যমূল্যে সার-বীজ পাওয়া গেলে বা সরকারের কাছে সরাসরি ধান বিক্রির

সুযোগ হলে, সেটি নিঃসন্দেহে কৃষকের জন্য সুখবর। তবে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি সংশয়ও আছে। বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে যেমনটি উঠে এসেছে। একজন কৃষক সেখানে তার দ্বিধার কথা জানিয়েছেন এভাবে, উদ্যোগটি বাস্তবে প্রতিফলিত হলে কৃষকের জন্য লাভজনক হতে পারে, কিন্তু বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব হবে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত নন। এই দ্বিধাই আসলে বাংলাদেশের কৃষকের বহু বছরের অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি। প্রতিশ্রুতি নতুন নয়, কিন্তু পূরণের নজির কম।

সত্যিকারের হালখাতা মানে কেবল নতুন খাতা খোলা নয়, পুরনো বকেয়া স্বীকার করাও। রাষ্ট্রের এই বকেয়া আছে কৃষকের কাছে — দশকের পর দশকের অবহেলার হিসাব। কৃষক কার্ড যদি সেই হিসাব মেটানোর সত্যিকারের সূচনা হয়, তবেই এই বৈশাখে একটু অন্যরকম মিষ্টির স্বাদ পাবেন হালচাষের মানুষ। নইলে এটিও হবে আরেকটি চকচকে প্রতিশ্রুতি, যার মেয়াদ শেষ হতে সময় লাগে না। কৃষক কার্ড কোনো খয়রাতি কর্মসূচি নয়, বরং এটি দেশের ১৮ কোটি মানুষের অন্নদাতা কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনের এক দূরদর্শী ও স্মার্ট কৌশল। এটি কেবল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির মাধ্যম নয়, বরং কৃষকের ন্যায্য অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করার এক বলিষ্ঠ অঙ্গীকার। এই কার্ডের মাধ্যমে কৃষকের পরিচয় এবং তাদের পরিশ্রমের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। একটি কেন্দ্রীয় ও সংরক্ষিত তথ্যভান্ডারের মাধ্যমে কৃষকের জমির পরিমাণ, উৎপাদিত ফসলের ধরণসহ যাবতীয় তথ্য সংরক্ষিত থাকবে, যা ভবিষ্যতে জাতীয় কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে পথ দেখাবে। এর ফলে সরকারি সেবা ও সহায়তা সরাসরি কৃষকের কাছে পৌঁছাবে, যেখানে কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকবে না। ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সাথে জড়িত প্রতিটি প্রকৃত কৃষক এই সার্বজনীন ডিজিটাল পরিচয়পত্রের মাধ্যমে সমাজে নিজের অবস্থান সুসংহত করতে পারবেন।

বাংলাদেশের কৃষি বিপ্লবের এই ধারা মূলত এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার ফসল। শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দূরদর্শী ‘খাল খনন কর্মসূচি’র মাধ্যমে দেশে সেচ ব্যবস্থা ও কৃষি উৎপাদনের যে সূচনা হয়েছিল, পরবর্তীতে দেশনেত্রী খালেদা জিয়া কৃষিঋণ মওকুফ ও সারে ভর্তুকি প্রবর্তনের মাধ্যমে তাকে আরও বেগবান করেন। পূর্বসূরিদের সেই জনকল্যাণমূলক নীতি অনুসরণ করেই বর্তমান সরকার কৃষিকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষিকে কেবল উৎপাদনের মাধ্যম হিসেবে না দেখে, কৃষককে তার প্রকৃত সম্মান ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন এবং কৃষিখাতকে এক নতুন শিখরে নিয়ে যেতে ‘কৃষক কার্ড’ এক অনন্য ও অপরিহার্য হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

#

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার

পিআইডি ফিচার